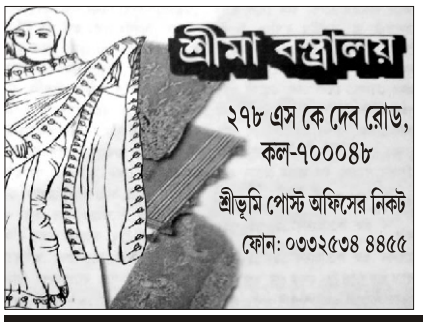

সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ৩০ জৈষ্ঠ ১৪২৬ ● শুক্রবার ১৪ জুন ২০১৯ ● ৫ টাকা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ
কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র
অতি সুলভে তিন
মাসের বেসিক কোর্স

বাজার কলকাতা

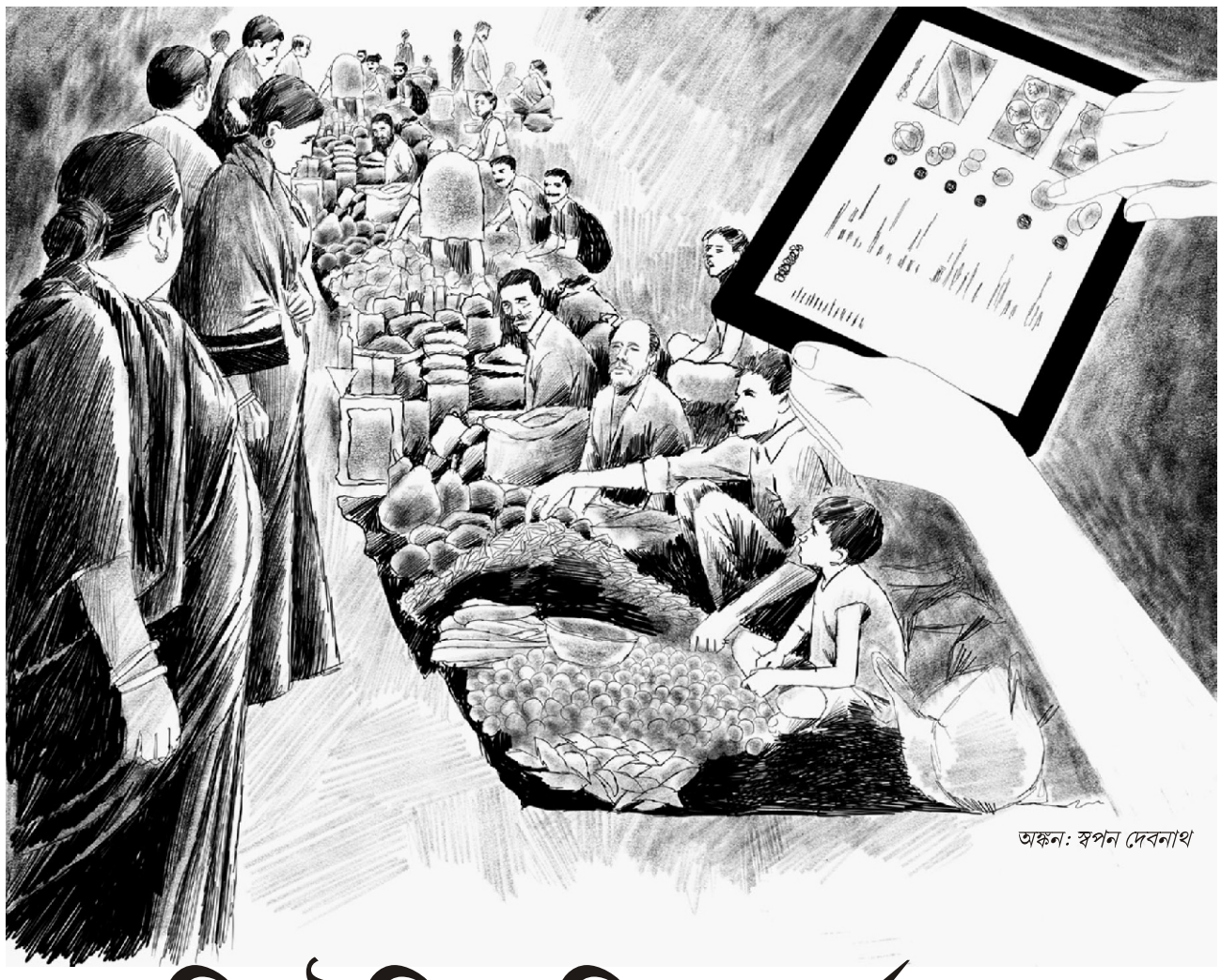

অঙ্কন: স্বপন দেবনাথ

একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ডঃ শ্রীময়ী গুহ ঠাকুরতা

বাজার হল একটি অর্থনৈতিক স্থান বিশেষ। সেখানে চলে নানা লেন-দেন, হরেক রকমের কেনা-বেচা। কিন্তু বাজার একটি সামাজিক জমায়েতও বটে, যেখানে প্রত্যেকদিন নানা বর্ণের, জাতি-ধর্মের, ভাষার মানুষ এসে মেশে। যে জায়গায় রাস্তা জুড়ে বাজার বসে তার চরিত্রও নিবিড়ভাবে জুড়ে যায় এই বাজারের সাথে, যার প্রতিফলন হয় স্থানের নামে যেমন শ্যামবাজার বা বাগবাজার। কলকাতার এই সকল বাজারের ইতিহাস খুব প্রাচীন এবং শহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণকের হাত ধরে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলে পদার্পণ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে সুতোনটি গ্রাম (উত্তর কলকাতা-বাগবাজার থেকে বৌবাজার অঞ্চল), কলকাতা গ্রাম (মধ্য কলকাতা-বড়বাজার ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চল) এবং গোবিন্দপুর গ্রাম (দক্ষিণ কলকাতা)-কে নিয়ে এখানে তাদের বসবাসের মত একটি নগর গড়ে তুলবে। চার্ণকের এই সিদ্ধান্তের পিছনে নানা রাজনৈতিক ও নিরাপত্ত সম্বন্ধীয় কারণ ছিল। তবে এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যও তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। সুতোনুটির সুতোরহাট, শ্যামবাজার, বাগবাজার, শোভাবাজার, লালবাজার, রাধাবাজার, বৌবাজার এবং বিশেষ করে বড়বাজারের নানাবিধ ব্যবসার উপস্থিতি চার্ণককে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এই তিনটি গ্রামের আদি বাসিন্দা শেঠ ও বসাকদের পরিবারের উপস্থিতি এই বাজারগুলিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। শেঠ, বসাকদের সাথে এই সময় রায় চৌধুরীদের পরিবার, দেব, মিত্র, দত্ত, মল্লিক ও ঠাকুরদের নামও এই অঞ্চলের ইতিহাসে পাওয়া যায়। এঁরা ইংরেজদের আসার পূর্ব থেকেই তাঁদের বাড়ি, বাগান, পুকুর ও বাজার দিয়ে এই অঞ্চলকে এক সুপ্ত আদিম নগরের রূপ দিয়েছিলেন।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা উপরোক্ত তিনটি গ্রামের জমিদারি সার্বর্ণ রায়চৌধুরির পরিবারের থেকে ক্রয় করে কলকাতা শহরের প্রথম আনুষ্ঠানিক সীমারেখা টেনে দেয়। জমিদার হিসাবে কোম্পানি (Public bazar) এই অঞ্চলের অন্তর্গত কিছু বাজারের মালিকানা পায়। যেমন -- বড়বাজার, সুতোনুটি হাট ও বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, রামবাজার, শোভাবাজার, বৈঠকখানা বাজার, বৌবাজার, লালবাজার, ধর্মতলা বাজার, মেছুয়া বাজার, কসাইতলা বাজার, শিমলা বাজার (হেঁদুয়া) ইত্যাদি। এই তালিকা মোটামুটি অষ্টাদশ শতকেও একই ছিল তবে বর্তমানে এই সব বাজারের বেশির ভাগই আজ আর নেই, তাদের ইতিহাস রয়ে গেছে স্থানের নামে। আবার কিছু বাজার অঞ্চল নিজেদের ব্যবসার চরিত্রে পরিবর্তন দেখেছে যেমন বৌবাজার বা বৈঠকখানা বাজার আগে তরি-তরকারিরই বাজার ছিল।

এই বাজারগুলির রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানি তুলে দেয় কলকাতার বড়লোক, প্রধাণত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের হাতে, যাঁদের কয়েকজনের পরিবারের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা ইংরেজদের দেওয়ান ও বানিয়া হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এই বাজারগুলির নিলামে তাঁরা ভাড়া নিতেন এবং এগুলির ব্যবসার দেখাশোনা করতেন ও বিবিধ বাজার কর দোকানদার, ব্যবসায়ীদের থেকে আদায় করতেন।

ক্রমে এই ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে জেগে ওঠে জমিদারি উচ্চাকাঙ্খা। তাঁরা নানা সুযোগে ব্যক্তিগত বাজার (Private bazar) স্থাপন করতে থাকে। তাঁদের প্রাসাদ প্রমাণ বাড়ি, তাকে ঘিরে তাঁদেরই পরিচারকদের বস্তি এবং তাঁদের বাড়ির লাগোয়া বাগানে স্থাপিত বাজার -- অষ্টাদশ শতকে কলকাতার নগরায়ণের পিছনে এই তিনটি উপাদানের বিশেষ অবদান আছে। এদেরকে ঘিরে গড়ে উঠল 'ওলা-টুলি পাড়া'।

১৭৫৮-এ পলাশী যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজরা গোবিন্দপুরে (ময়দানে) নতুন দূর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করে। ডিহি কলিকাতা (যেখানে পুরোনো কেল্লা নির্মিত হয়েছিল ঠিক বড়বাজারের পাশে) এবং এই নতুন দূর্গকে ঘিরে গড়ে ওঠে European-দের কলকাতা বা White Town. অপরদিকে শহরের উত্তরে সুতোনুটিতে এই পরিবারগুলি ও তাঁদের বাজার ঘিরে গড়ে ওঠে ভারতীয়দের শহর বা Black Town। ইংরেজদের কাজে এই বাজারগুলির পরিকাঠামো এবং প্রক্রিয়া তাঁদের আন্তর্জাতিক ব্যবসার পদ্ধতির থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। তাই কলকাতার বাজারগুলি তাঁদের কাছে ছিল অচেনা, ব্রাত্য- 'busy, crowded, filthy, composed of irregular and confused heap of straw huts'। ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনায় 'অসভ্য' 'বর্বর'। কিন্তু এই বাজারগুলিকে কেন্দ্র করেই কলকাতা, বিশেষ করে উত্তরে, ১৮শ শতকে সতস্ফূর্তভাবে, নিজের সাবলীল ছন্দে, আঞ্চলিকতাকে গায়ে মেখে শহর হয়ে উঠেছিল। শহুরে জমিদাররা তাঁদের বাজার অঞ্চলকে ঘিরে প্রভাব ফেলল তখনকার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের উপর। গড়ে উঠল তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আখরাই গান, নিধুবাবুর টপ্পা, বাঈজির নাচ, যাত্রা ইত্যাদি। উৎপত্তি হল 'বাবু'-কালচারের।

ইংরেজরা এই সময় বেশী মাথা ঘামায়নি -- তাঁরা তখন ভারতে সাম্রাজ্য গড়তে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সব পাল্টে গেল ১৯শ শতকে -- ভারত জুড়ে স্থাপিত হল কোম্পানির রাজ। তাঁদের তখন মনে হল তাঁদের রাজনৈতিক সাফল্যের সাথে বড়ই বেমানান তাঁদের রাজধানী -- কলকাতা। শহরগড়ার কাজে মনোনিবেশ করলেন বিদেশী শাসকদল। স্থাপিত হল Lottery Committee- (১৮১৭) পরবর্তীকালে Corporation (১৮৭৬)। কলকাতায় তৈরি হল নতুন রাস্তা, স্থাপিত হল নগরায়নের নতুন পশ্চিমী মন্ত্র। বাতিল হল

এরপর ৪ পাতায়

গান্ধী সেবা সঙ্ঘে সোমবারের সান্ধ্য আড্ডা

গৌতম সাহা

আপনার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা চেনাজানা মানুষজনের মধ্যে চিকিৎসা চলছে এমন কি কেউ ক্যানসার রোগী আছেন? প্রশ্নের উত্তরটা আমিই দিতে পারি। এই মুহূর্তে আপনার চেনাজানা এক বা একাধিক ক্যানসার রোগী চিকিৎসার জন্য মুম্বাই, ভেলোর, চেন্নাই বা কলকাতার বিভিন্ন

সরকারী আর বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি আছেন বা চিকিৎসার জন্য ছোটাছুটি করছেন। রোগী একা শুধু নয়, তার বাড়ির সবার মুখ বিষণ্ণ, বিমর্ষ ও ক্লান্ত। চোখমুখ ঘিরে অনিশ্চয়তার ছায়া সুস্পষ্ট। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এটাই সাধারণ চিত্র। এবার আপনাকে কোনও এক সোমবার, সন্ধ্যায় গান্ধী সেবা সংঘের দোতলার হল ঘরে চলে আসতে অনুরোধ করবো। লম্বা টেবিলের চারপাশ ঘিরে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ জন মহিলা-পুরুষ রীতিমত গল্প আড্ডায় মেতে আছেন। হয়তো দেখবেন কোনও এক মাঝ বয়সী মহিলা, কেমোথেরাপির জন্য যার মাথার প্রায় সব চুল পড়ে গেছে। তিনি একটি পল্লীগীতি গাইছেন চোখ বন্ধ করে বা রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। মানের বিচারে হয়তো ডাঁহা ফেল, হয়তো মাঝের কয়েকটা লাইনই উধাও, কিন্তু লক্ষ্য করুন, তার চোখমুখ আনন্দে ভরে আছে। ঐ যে কোণের দিকে ছোটখাটো চেহারার যে মানুষটি এতক্ষন মাথা নীচু করে শুধু শুনছিলেন আর চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলেন, এবার তিনি ও খুব নিচু গলায় একটা সুপরিচিত শ্যামাসঙ্গীত গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন। সবাই উৎসাহ দিতেই গলা বাড়ালেন সাধ্যমত। কতদিন যে তার গলা দিয়ে কোন গান বেরোয়নি তা হয়তো নিজেই ভুলে গেছেন, ফাঁকে ফাঁকে চলছে গল্প আর আড্ডা। একেবারেই বাঁধন হারা, নিয়ম ছাড়া। বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষটি শোনাচ্ছেন তাঁর দেশের মাছের গপ্পো। ''আপনাগো দ্যাশের মাছ ক্যামন যেন বিস্বাদ লাগে, আমাগো ওখানকার মাছ খাইলে আর এইসব মাছ এক্কেবারেই ভালো লাগবো না।'' জলপাইগুড়ি থেকে আসা ছবি বিশ্বাসও ছাড়ার পাত্রী নন। ''তিস্তা আর করোলা নদীর বরোলী মাছের পাতলা ঝোলের স্বাদ বাংলাদেশের মানুষ কি করে বুঝবেন।'' এমনি ভাবেই চলে আসে তুলাইপাঞ্জি চালের স্বাদ আর গন্ধের কথা। আরও কতো কি, তার হিসাব রাখা মুশকিল। এর মাঝেই হয়তো কাগজের প্লেটে প্লেটে চলে এল চিঁড়ের পোলাও আর কাগজের কাপে গরম গরম লিকার চা। পরিবেশন করছে গান্ধী সেবা সংঘেরই কিছু সদস্য আর তাঁদের সঙ্গী-সাথীরা। ওই পোলাও বাড়ি থেকে তৈরী করে নিয়ে এসেছেন কোনো একজন সদস্যা। কোনদিন হয়তো অন্য কেউ আনবে ঘুগনী না হয় সিঙ্গারা বা অন্য কিছু। আর কিছু না থাকলে বিস্কুট-চা তো আছেই। লক্ষ্য করুন, বড়দের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কম বয়সী ছেলেমেয়েও উৎসাহ নিয়ে ছড়া বলছে বা গান করছে অথবা একটু নেচেও দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই হাততালির ঝড় তুলছে সবাই। এ সবের ফাঁকেই বালুরঘাট থেকে আসা প্রায় ন্যাড়া মাথার মহিলাটি পাশে বসা এখানকার বৌদিকে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করছেন, 'এই যে আমার ক্যানসার জেনেও পাশে বসে গল্প করছেন, আমাদের গান শোনাচ্ছেন, এসবে ভয় করে না আপনাদের? কলকাতায় আগে কখনো আসিনি, চিকিৎসা করতেই প্রথম

আসা। বড় ভয় করছিল, একে বারে নতুন জায়গা, তারপর অসুখটা তো ক্যানসার! কিন্তু, এখানে থেকে, তারপর আপনাদের পেয়ে, বড় ভালো লাগছে। খুব আনন্দ হচ্ছে, অনেকটাই ভয় কেটে গেছে, সাহসও বেড়েছে।' এ ভাবেই গল্প-আড্ডা করতে করতে কখন যে দেড়-দুঘন্টা পেরিয়ে যায় টের পায় না কেউই। কিন্তু থামতেই হয়। এরপর রাতের খাওয়া-দাওয়া আছে, বিশ্রাম আছে, কালকে আবার হাসপাতালে দৌড়নো আছে। আর, এতক্ষন সঙ্ঘের আর অন্যান্যরা বাইরে থেকে যাঁরা এসেছেন তাদেরও ঘরে ফেরার তারা আছে। তবে, আজকের সন্ধ্যেটা তো বেশ আনন্দে কাটল। হ্যাঁ!

গত কয়েক মাস ধরে প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় গল্প-গান আর আড্ডার আসর বসছে গান্ধী সেবা সংঘের সেবা নিবাসের ২৭টি ঘরে থাকা ক্যানসার রোগী ও তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে। সঙ্গে থাকছেন গান্ধী সেবা সংঘের কয়েকজন সদস্য ও অন্যান্য সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বা অন্য যে কেউ। রোগীদের মুখ নিয়মিত ভাবেই পাল্টে যায়, আসে নতুন মুখ, নতুন করে পরিচয় হয়, গল্পো জমে ওঠে, অন্য সুরে, অন্য ভাবে।

এই আড্ডায় কোনও বাধা-নিষেধ নেই, শুধু একটা ছাড়া, অসুখ-বিসুখ, রোগ আর চিকিৎসা নিয়ে কোনও গল্প বা উপদেশ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। হাঁসি-ঠাট্টা- গল্প-গানের মাধ্যমে সেবা নিবাসে থাকা রোগীদের একটু আনন্দ দেওয়া, মানসিকভাবে চাঙ্গা করা। এই আসরে আপনাকেও খোলা আমন্ত্রণ। যেকোনও সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গান্ধী সেবা সংঘের দোতলায়। ভালো লাগলে আবার আসবেন। কি ভাবে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আরও একটু আনন্দ দেওয়া যায়, আর মানসিক বল দেওয়া যায় এই সব ক্যানসার রোগীদের। তবে আবারও বলছি, সোমবার সন্ধ্যাটি শুধু নিছক গল্প আর আড্ডার দিন, কোন রোগের কথা নয়।

ছবি: প্রতিবেদক

সংঘ সংবাদ

গ্রন্থাগার

সঙ্ঘ গ্রন্থগারটি সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে। নিয়মিত কিছু গ্রাহক বই দেওয়া-নেওয়া করতে আসেন। বেশ কিছু জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠকদের জন্য রাখা হয়। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় সদস্য-সদস্যারা গল্প-আড্ডা-হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়েই সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিক আলোচনা করতে ভালোবাসেন। সঙ্ঘের অনেকদিনের পুরনো ঐতিহ্য 'পাঠচক্র' আবার আরম্ভ হয়েছে। প্রতি মাসের কোনও একটি শুক্রবার 'পাঠচক্রের' আসর বসে। গ্রন্থাগারই এর প্রধান উদ্যোক্তা। গত ৫ই এপ্রিল সুদূর মুম্বাই নিবাসী অধ্যাপিকা শ্রীমতি পারমিতা মুখার্জী মল্লিক ও তাঁর তরুণী কন্যা সংকল্পিতা পাঠচক্রের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁদের একঝুড়ি স্বলিখিত কবিতা আমাদের শোনান। যার মধ্যেও অনেক উপস্থিত উৎসাহী মানুষ সেখানে স্বলিখিত কবিতা শোনান। আমরা সঙ্ঘের তরফ থেকে তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। গত ১০ই মে অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীময়ী গুহঠাকুরতা একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। বিষয়টি হল 'কলকাতার বাজার ও তার পটভূমি'। আমাদের প্রিয় কলকাতা শহর সেই পুরনো দিনে কেমন ছিল আর আজ কেমন হয়েছে। তার একটি চিত্র সকলের সামনে ভেসে ওঠে। স্লাইড সহযোগে, সহজ সরল ভাষায় শ্রীময়ীর বক্তব্য সকলের মনকে ছুঁয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে একটি স্মরণসভা সঙ্ঘ ভবনে আয়োজন করা হয়। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, আত্মবিকাশ পত্রিকা ও লেকটাউন অ্যাসোসিয়েশন এই স্মরণ সভার প্রধান আয়োজক ছিল।

ইন্দুভূষণ মহাশয় লেকটাউনেরই বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র ও বন্ধুরা এসে নিজেদের বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে, সকলেই ইন্দুভূষণ মহাশয় সম্পর্কে জানতে পারেন ও উপকৃত হন। গান্ধী সবা সঙ্ঘের গ্রন্থাগারে বহু অমূল্য ও দুর্মূল্য বই সংগ্রহে আছে। সবাইকে আহ্বান জানাই সদস্য হবার জন্য।

শিশুবিকাশ

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের জন্য আমাদের করবার ইচ্ছা অনেক। কিন্তু এই মূহুর্তে আমরা একটি শরীর শিক্ষার ক্লাস ও আঁকার ক্লাস ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারিনি। প্রায় ৩৫/৪০ জন শিশু এই ক্লাসগুলিতে যোগদান করে। প্রতি রবিবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এই ক্লাস হয়।

কম্পিউটার ক্লাস

প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০, শনিবার বিকেল ৪টে থেকে ৬টা এবং রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সঙ্ঘ ভবনে কম্পিউটার ক্লাস চলে। এই অঞ্চলের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্প মূল্যে কম্পিউটার শেখাবার উদ্দেশ্যেই এই ক্লাস শুরু করা হয়েছে।

বয়স্ক মানুষদের শেখারও সুযোগ আছে। এখন প্রায় ২৮ জন শিক্ষার্থী এই ক্লাসে আছে যারা নিয়মিত আসছেন। মাসিক মাত্র ৫০ টাকাতেই এখানে ভর্তি হওয়া যায়।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল

হাসপাতালের পরিষেবা এখনও পর্যন্ত বহির্বিভাগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ আছে। বহির্বিভাগটা বেশ কিছু খ্যাতনামা ডাক্তারদের সহযোগীতায় ভালো চলছে। নানারকম পরীক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

দন্তবিভাগটিতেও রোগীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা সেখানে হচ্ছে। E.C.G, U.S.G, X-RAY, চক্ষু পরীক্ষা এখানে নিয়মিত হচ্ছে।

মেসরা গ্রামের হাট

গীতা বিশ্বাস

রাঁচীর হালোরীবাগ রোড থেকে মেসরা মোড় হয়ে লাল কাঁকড়ের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে মেসরা গ্রামের দিকে।

যদিও রাস্তাটা গিয়ে থেমেছে বি.আই.টি (বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি)-র গেটে। তবে এই রাস্তা থেকে মেঠো পথ চলে গেছে গ্রামের দিকে। রাস্তার দুধারে পলাশের সারি। বসন্তে লাল পলাশে ঢেকে থাকে গাছগুলো। কত পাখীর আনাগোনা, কোকিলের কুহু কুহু তানে দোয়েল গাছে গাছে দোল খায়। পাশে ন্যাসপাতি গাছের সারি। কেউ হয়তো নেতার হাট থেকে এনে লাগিয়েছিল। নেতার হাটে প্রচুর ন্যাসপাতি হয়। দুপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত। এই রুক্ষ মাটিতে যা ফসল হয় দুবেলা না হয় একবেলা খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকে গরীব মানুষগুলো। শীতে দূরে দূরে ক্ষেতগুলো হলুদ সরষে ফুলে ভরে থাকে। লাল মাটির রাস্তার দুপাশে মাটির বাড়ী টালীর বা টিনের ছাউনী। চারিদিকে দূরে দূরে ছন্নছাড়া আদিবাসী গ্রাম। আর শাল-সেগুনের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ডাল পাতা কুড়িয়ে দিন গুজরানে রুক্ষ পাথুরে মাটির সংগে সংঘর্ষ করতে করতেই দিন যায়। মানুষগুলোকে মুখে না হাসি না দুঃখ। না পেতে পেতে দুঃখটাই ওরা ভুলে গেছে। দূরে দূরে গ্রামের মানুষগুলোর একমাত্র সমাগমের জায়গা এই মেসরা মোড়ের হাট। পাশে গ্রামের হাট সপ্তাহে একদিন বসে। হাটে ঢুকতেই মাটির হাড়িতে হাঁড়িয়া (পান্তা ভাত পচিয়ে মদ) নিয়ে বসে থাকে আদিবাসী মহিলারা। মরদগুলো হাটের শেষে নেশায় বুঁদ হয়ে ঘরে ফেরে। হাঁড়িয়ার সাথে থাকে কাঁচালঙ্কা, কাঁচাছোলা পেঁয়াজ দিয়ে মাখা। সপ্তাহে শেষে হাটই ওদের জীবন সঙ্গম। ভালোলাগার একমাত্র জায়গা। পসরা সাজিয়ে বসে থাকে আদিবাসী মেয়ে বৌ-রা। কেনা-বেঁচা চলে। মাছ-মুরগী-ছাগল থেকে টমেটো-বেগুন-সীম-বটবটী-বিনস-কপি মরশুমের সব সবজী নিয়ে বসে থাকে। জিলিপি-তেলেভাজার দোকানও থাকে। গামছা-ধুতি-শাড়ি-লুঙগি, জামা-কাপড়ের পসরা নিয়েও বসে কিছু লোক। গ্রীষ্মে কাঁচা-পাকা আম, কাঁঠাল জাম মরসুমের ফল বাগানে-জঙ্গলে গাছে যা পায় কুড়িয়ে পেড়ে নিয়ে আসে দুটো পয়সার জন্য, ঐ বিক্রি করে যা পায় চাল কিনে নিয়ে যায় সারা সপ্তাহের জন্য।

সুতনী নদী পার হয়ে দূরে একটা গ্রামে থেকে লোকেরা বাড়ি বাড়ি (বিআইটি কোয়ার্টারে) কাজ করে রাতে হাঁড়িয়া বানায়। তাই হাটে বেঁচতে আসে। ১৫ ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস এবং ২৬ শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস এই দিনগুলো এদের কাছে আলাদা কোনও মানে রাখে না। বরং বিরসা মুন্ডাকে এরা ভগবানের মতো মানে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন বলে। ১৫ ই আগষ্ট বি আই টির ছাত্রদের প্রসেশন দেখে সুতনী বলে এই দিন আমাদের কাছে আলাদা কোন উৎসব নয়। যে দিন আমরা পেট ভরে মাংস-ভাত খেতে পারি সেদিনই আমাদের উৎসব। মানে স্বাধীনতা এদের জীবনে আলাদা কোনো মানে রাখে না। স্বামীরা মদ খেতে খেতে মরে গেছে। নিজেও দেশী মদ ও হাঁড়িয়া বেঁচে বড় মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিল। ওদের থেকে ও গরীব ঘরে। শাওরীটা সারাদিন মেয়েটাকে দিয়ে খাটাতো। দুবেলা পেটভরে খেতেও দিত না। নিজেদের জুটবে তবে তো দেবে। আর মরদটা সেই সকালে দুটো পান্তা ভাত খেয়ে বেড়িয়ে যেত কাজে সাঁজের বেলায় ফিরত নেশায় বুঁদ হয়ে। শাউড়ী-স্বামী মেয়েটাকে নিতে এলে মেয়েটা ভয়ে কোয়ার্টারে বাবুদের বাড়ী লুকিয়ে থাকে যেখানে কাজ করে দুবেলা তো খেতে পায়! আর যখন ঠিকাদারদের কাছে কুলি-মজুরের কাজ পায় তখন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে বেলুনীর মতোন চেহারা চাঁদপানা মুখটা শুকনো করে মায়ের হাতে তুলে দেয় পঞ্চাশ-ষাট টাকা দিনের শেষে।

আর রহিলা হাটে বেচতে আসে হাঁস-মুরগী-ছাগল যেগুলো ও পালে। নিজে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে। মরদটা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। তপশীলি উপজাতি ভুক্ত তবুও একটা চাকরি হয়নি। সেও সারাদিন মজুরী করে। দিনের শেষে পঞ্চাশ-ষাট টাকা তুলে দেয় বৌ-এর হাতে। তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসার। তাও সবসময় রহিলার মুখে হাসি কারণ মরদটা নেশা করে না। বাবুদের বাড়ী কাজ করে তিনটে ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। গ্রামের সরকারী স্কুলে পাঠায় না। ইংরাজী শিখে যদি কিছু করে যেতে পারে, তাই মেমসাহেবের প্রাইভেট স্কুলে পাঠায়। দুশো টাকা করে ফীসও লাগে।

ছবি: বিশেষ সৌজন্যে

নিলম রহিলার বোনের বন্ধু এখানে এক বাড়িতে থাকে, বাচ্চা দেখভাল করে। পাঁচশ টাকা পায়। রহিলাই ঠিক করে দিয়েছে। মেয়েটা খ্রীষ্টান। তাতে কী। গরীবি ওদের ধর্মের ভেদাভেদটা ভুলিয়ে দিয়েছে। এই গ্রামের বেশীর ভাগ লোক ট্রেনে চড়া তো দূরের কথা, ট্রেনও কোনও দিন দেখেনি। গ্রামে একটা হেলথ সেন্টার আছে তবে সেখানে না আছে ভালো ডাক্তার না আছে ওষুধ নিলম মেয়েটা বড়ো ভালো সে বড় পরিশ্রমী। মাধ্যমিকে দ্বিতীয় বিভাগে ভলো নম্বর নিয়ে পাশ করেছে। আরও পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু পয়সা নেই। হাজারীবাগের কোনও গ্রাম থেকে এসেছে। চার বোন। চাষবাস করে খাওয়া তো জুটে যায় তবে নগদ পয়সার অভাব। প্রত্যেক রবিবার চার্চে গিয়ে প্রভু, যিশুর কাছে প্রার্থনা করে। সেখানে চা বিস্কুট দেয়। ব্রেডও দেয়। গ্রামেই ছোট্ট একটা চার্চ। ফাদার খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। তাতে নীলম উৎসাহ পায় জীবনে কিছু করে দেখাবার। কিছু পয়সা জমলে ইচ্ছে কলেজে ভর্তি হবে। ছোট্ট ভাইটাকে অনেক লেখাপড়া শেখাবে নিজেরও ইচ্ছে পুলিশে চাকরী করা, কিছু না হলে ট্রাফিক পুলিশ। রাঁচীতে তো দেখেছে কতো মেয়ে ট্রাফিক পুলিশের কাজ করে।

সরসী পঞ্চাশ বছর বয়সে কাঁচাপাকা তনমনে মেয়ে আর নেই। মরদটা চিররুগ্ন। কাজ করতে পারে না। সরসী সারাদিন কাজ করে নিজে খায় ও মরদটাকে খাওয়ায়। আর সারাদিন বিড়বিড় করে। কেউ কিছু বললে চিৎকার করে। গায়ে দেবার কাঁথা ছাড়া একটা কম্বল বা লেপও এদের নেই। শীতে বড় কষ্ট। এদের না আছে পেটে ভাত না আছে গায়ে গরম জামা-কাপড়। প্রকৃতি মায়ের ভালোবাসাই এদের একমাত্র সম্বল একমাত্র আশ্রয়।

গাছে গাছে লাল পলাশের ঝাড়, নদীগর্ভে মাছ, গাছে ফল আর গা গরম করার জন্য সূর্য্যের তাপ। শীতের রাতে খড়কুটো জ্বালিয়ে শরীরকে গরম করে। হাড়িয়াখেয়ে মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্যে মত্ত হয়ে যায় মেয়ে-পুরুষগুলো। বিয়ে-সাদিতেও চলে ওদের এই নাচা-গানা মদ-মাংস। হাড়িয়া আর দেশী মদ খেয়ে হাতে হাত ধরে নাচ করে প্রকৃতির আশ্রয়ে আনন্দ করে এঁরা বেঁচে থাকে এই বিংশ শতাব্দীতেও। প্রকৃতিই এদের বেঁচে থাকার রশদ জোগায়। বড় সৎ মানুষগুলো। বঞ্চনা জানেনা শঠতা কী বোঝে না। হাটই ওদের দেওয়া-নেওয়া, কেনা-বেঁচা, ভাব-ভালোবাসা আদান-প্রদান করার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল অর্গানাইজেশন
মাণিক্য মঞ্চ
নতুন প্রযোজনার কাজ চলছে
ইচ্ছুক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা
যোগাযোগ করুন।
গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কল-৪৮
নির্মল শিকদার: ৯৮৩০০৯৭৩৮,
ধনঞ্জয় আঢ্য: ৯৬৭৪০৬০৪৫০
email: ekco2006@gmail.com

amantran
HOUSE OF EXQUISITE CATERING & SERVICING
Exquisite Caterer
HOUSE OF EXQUISITE CATERING & SERVICING
P-132, LAKE TOWN, BLOCK-A, KOLKATA-700 089
P-2521 3554/2534 9879/2534 6653
M-98300 49738

সেবক
৩০ জৈষ্ঠ ১৪২৬ শুক্রবার ● ১৪ জুন ২০১৯

পৌষমেলা করতেই হবে

পৌষমেলা নিয়ে এবার বল গড়াত চলেছে প্রধানমন্ত্রীর কোর্টে। সম্প্রতি আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী মনোনীত বিশ্বভারতীর কোর্ট সদস্য, রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, পৌষমেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিক কেন্দ্রীয় সরকারই। জানানো হবে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রককেও। বিশ্বভারতীর হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে পৌষমেলার দায়িত্ব নেয়, এই প্রস্তাবে সহমত হয়েছেন কোর্টের বাকি সদস্যেরাও। ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এবার থেকে তাঁরা শুধু পৌষ উৎসব করবেন। পৌষমেলা পরিচালনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর পরেই পৌষমেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় সব মহলে। পৌষমেলা বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আমরা চাই যেভাবেই হোক, যে-ই করুক না কেন, পরিবেশ ও অন্য সব কিছু বজায় রেখেই পৌষমেলা হোক। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্মেলন কক্ষে কোর্ট বৈঠক হয়। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সহ কোর্ট সদস্যদের উপস্থিতিতে স্বপনবাবু তাঁর প্রস্তাবের কথা জানান। 'রীতি মেনে আমরা পৌষ উৎসব করব। কিন্তু মেলা পরিচালনার দায়িত্ব কোনও ভাবেই বিশ্বভারতীর পক্ষে আর নেওয়া সম্ভব নয়।' কেন কন্দ্রীয় সরকার? কেন বিশ্বভারতী নয়? স্বপনবাবুর যুক্তি, বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কেন্দ্রেরই এই মেলার দায়িত্ব নেওয়া উচিত। ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে পৌষমেলাকে সংরক্ষণ করাও উচিত বলে মনে করেন তিনি। কোর্ট সদস্যদের মতে, পৌষমেলা এবং পৌষ উৎসব দুটি আলাদা বিষয়। পৌষ উৎসব পুরোপুরি বিশ্বভারতীর। সেখানে কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ হবে না। কিন্তু বিশ্বভারতীর মাঠেই হওয়া পৌষমেলার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেই নিতে পারে। এমতাবস্থায়, পরিচালনার দায়িত্ব যার হাতেই থাক, পৌষমেলা হোক -- একান্তভাবে এটা চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দা, পড়ুয়া, প্রাক্তনী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পত্রিকা 'সেবক'ও।

বাজার কলকাতা

১ পাতার পর

বাজার ও তার মালিকের বিশেষ ভূমিকা। কলকাতা হয়ে উঠল ব্রিটিশদের রাজধানী। বাজার বন্ধ হয়নি -- কিন্তু থেকে গেল নেহাতই এক অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে। অষ্টাদশ শতকের গতিশীলতাকে শ্বাসরুদ্ধ করল ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা। তবুও বাজার উধাও হয়ে যায়নি -- তার নিদর্শন আমরা আজও শহরের বুকে দেখতে পাই।

বর্তমানে এই বাজারের সামনে নতুন challenge-- Supermarket এবং on-line shopping-এর রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতা। তবে আশা রাখি কলকাতার বাজার যদি ইংরেজদের টেক্কা দিয়ে থাকতে পারে, তাহলে আজকের এই প্রতিদ্বন্দ্বীকেও সে সহজে জয়ী হতে দেবে না। কারণ কলকাতার বাজার শুধু লেন-দেনের স্থান নয়-- এ যেন শহরের হৃদস্পন্দন।

গান্ধী সেবা নিবাস

ক্যানসার রোগী ও সাথীর জন্য অতি অল্প খরচে নির্ভয়ে
সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা গান্ধী সেবা সঙ্ঘ সেবা নিবাস
গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস. কে. দেব রোড, শ্রীভূমি, কোলকাতা-৪৮
শ্রীভূমি পোস্ট অফিসের পাশে

প্রয়োজনে যোগাযোগ গান্ধী সেবা সঙ্ঘ (033) 25214011
দীপা দত্ত: 9007833036, অপূর্ব কুন্ডু: 9593576084
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য: 9836133762 গৌতম সাহা: 9432000260

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের জন্য
মুক্ত হস্তে দান করুন

সমাজজীবনে মেলার প্রভাব

বরুণদেব ঘোষ

মেলা কথাটি এসেছে মিলন থেকে, মেলা মানে উৎসব উপলক্ষ্যে অস্থায়ী হাট। মেলা যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে মিলিত হন জিনিসপত্রের আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের জন্য। তাইতো, ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। এই সকল মেলাতে নানা রকমের পণ্য বিকিকিনি হয়। বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের সমাগম হয়। প্রভূত পরিমাণে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের অর্থনীতির ওপর বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত মেলার প্রভাব বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এইসব মেলায় উৎপাদক তার উৎপাদিত দ্রব্যের স্থান পায় প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্যে। মেলাগুলিতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, পুজোর মেলা, রথের মেলা, শিল্প মেলা ইত্যাদি। এছাড়াও বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত মেলাও ক্বচিৎ কখনো দেখা যায়। আপরদিকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই সকল মেলা থেকে ক্রয় করতে পারে, প্রকৃত অর্থে এই মেলাগুলি আর্থিক আদান-প্রদানের জায়গা। সারা বছর ধরেই গ্রামের মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন তাঁদের তৈরী করা জিনিস বিক্রয় করার এবং প্রয়োজনীয় ঘর-

ছবি: বিশেষ সৌজন্যে

গৃহস্থালীর জিনিস ক্রয় করার লক্ষ্যে। তাইতো মেলার প্রভাব গ্রামের মানুষের ওপর প্রকট রূপে বিরাজমান। শহরাঞ্চলের মেলাগুলি মূলত বিনোদন নির্ভর। যাত্রা, নাটক, পালাগান, বাউলগান ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের অখ্যাত শিল্পীও তাঁর শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করে এই সব মেলায়। আবার অন্যদিকে শহর ও গ্রামের মধ্যে মেলবন্ধন করে এইসকল মেলা। কারণ গ্রামের মানুষের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে পায় এই মেলাগুলি যেখান থেকে পণ্যসামগ্রী শত হাত ঘুরে শহরে আসে। আবার শহরের কলকারখানায় তৈরী জিনিসও ঠিক একইভাবে গ্রামের মানুষের করায়ত্ব হয়। তাইতো কবিগুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে --

'এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে করে আহ্বান'।

প্রকটরূপে প্রতীয়মাণ হয়। কারণ গ্রামের কৃষক তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণন করার সুযোগ পায় এই মেলাগুলিতে। আবার অপরদিকে তাঁতি, কামার, কুমোর, পটশিল্পী এঁরাও এঁদের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের স্থান হিসাবে এই মেলাগুলিকেই নির্বাচন করে। এছাড়া আর উপায়-ই বা কি আছে? কারণ প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের পক্ষে তো আর শহরাঞ্চলে এসে তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করা অনেক সময়েই সম্ভবপর হয় না। তাহলে তারা করবে কি? কারণ এই সকল পণ্য বিক্রয় করতে না পারলে তাদের অর্থ সমাগম হয় না, আর অর্থ ভিন্ন তাদের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। আধুনিক সমাজে বিনিময় প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে তো মেলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

মেলা মানুষের জন্যই

সেবক প্রতিবেদন: ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানকার সাধারণ মানুষ আনন্দ করতে ভালোবাসে। গান গাইতে, নাচ করতে, বাজনা বাজাতে, ঘুড়ি ওড়াতে, বাজি ফাটাতে -- সবের মধ্যে একটা উৎসবের ছোঁয়া লাগিয়ে দেয়। এমনিতেই দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই হাজারো মেলার আয়োজন। গ্রামাঞ্চলে পাটি, ঝুড়ি বানানো হল -- শীতেকালে মেদিনীপুরে আরম্ভ হল পাটি মেলা। বাউলেরা দল বেঁধে শুরু করল জয়দেব, কেদুলীর মেলা। এখন এই মেলা বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। বহু দেশী বিদেশী শীতে সেখানে ভিড় করে। আমাদের দেশের কুম্ভ মেলার তো জগৎজোড়া নাম। গঙ্গাতে পূণ্য অবগাহনের সঙ্গে শত শত সাধু সন্ন্যাসী, যোগী, নাগা সন্ন্যাসীদের দর্শন করতে মানুষ বারে বারে ছুটে যায়। সে এক মানুষের অপূর্ব মহা মিলন ক্ষেত্র। শীতকালে দিকে দিকে পিঠে-পায়েস খাবার মেলা। শ্রীভূমিতে এই উৎসবকে 'কার্নিভাল' নামকরণ করেছে। গান, বজনা, নাটক, দেখেন এবং শোনেন। আর তার সঙ্গে মন ভরে পিঠে পুলি খাওয়া যায়।

বহু মানুষের জমায়েত হয় সেখানে। পুরুলিয়ার ছৌ মেলা, নদীয়ার পুতুল মেলা, রথের সময় রথের মেলা -- এসব হয়তো সকলেরই জানা। কোলকাতার বুকে সুভাষ মেলা একমাস ধরে চলে। কালী পুজোর সময় মিলন সঙ্ঘের মেলা সেও এক মাস ধরে চলে। গান নাচ, খাওয়া দাওয়া, জিনিস কেনা -- সর্বত্র উপচে পড়া ভিড়। আমাদের গামাঞ্চলে ও মফস্বল শহরতলিতে কত ধরণের মেলা ছড়িয়ে আছে, তার অনেকটাই হয়তো অজানা। পশু মেলা, পাখী মেলা, ইলিশ উৎসব, আম উৎসব, সবলা মেলা, চৈত্র মেলা, গাজনের মেলা, মেলা মানেই আনন্দ, আর মানুষের মিলন।

সঙ্ঘে পরিষেবাগুলি যেমন চলছে

দীপা দত্ত

চিকিৎসা বিভাগ:- এ্যালোপ্যাথি বিভাগে তিনজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরিচালনায় ২০ টাকা টিকিটের বিনিময়ে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। দৈনিক গড়ে ১৫-২০ জন রোগী পরিষেবা পান। হোমিওপ্যাথি বিভাগে দুজন চিকিৎসক সপ্তাহে ৫ দিন রোগী পিছু ১০ টাকা টিকিটের বিনিময়ে চিকিৎসা ও ওষুধ পান। দৈনিক গড়ে ৩০-৩৫ জন রোগী পরিষেবা পান।

চক্ষু বিভাগ:- প্রতি সোমবার সকালে মাত্র ৫ টাকা

টিকিটের বিনিময়ে চক্ষু পরীক্ষা, ওষুধ ও চশমা বিতরণ করা হয়। প্রয়োজনে বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকালে রোগীদের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। রোগী প্রতি ১০ টাকা টিকিটের বিনিময়ে গড়ে ৫-৬ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

সেবা নিবাস:- সম্প্রতি আমরা সেবা নিবাসের বেশ কিছুটা সম্প্রসারণ করতে পেরেছি। এখন আমাদের মোট আঠাশটি ঘর হয়েছে। প্রত্যেক ঘরে দুজন থাকতে পারবেন। গত কয়েক মাসে ৬৫-৭০% ক্যান্সার রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা এখানে এসে থেকেছেন। আমরা বেশ বড় একটি রান্নাঘরের ব্যবস্থা করেছি। যেখানে বারোটি বার্নারসহ গ্যাসের ব্যবস্থা আছে। বাসনপত্র দেওয়া হয়। রোগীরা নিজেদের পছন্দমত রান্না করে খেতে পারেন। এদের বিনোদনের জন্য প্রতি সোমবারের সান্ধ্য আড্ডা, টিভি ও ক্যারাম খেলার ব্যবস্থা, লাইব্রেরীর পত্র-পত্রিকাও থাকে।

সাংস্কৃতিক বিভাগ:- এই বিভাগের উদ্যোগে সঙ্ঘের নিজস্ব বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্যসভা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডঃ সুবীর গাঙ্গুলী ক্যানসার রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে কেবলমাত্র আলোচনা করেননি, জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের প্রতি সচেতনতা ও রোগীর আত্মীয় স্বজনকে সহানুভূতির সঙ্গে সাহস জাগানোর ভারও গ্রহণ করতে বলেছেন। এ এক ভীষণ যুদ্ধ যেখানে প্রবল মনোবল ও সহানুভূতির প্রয়োজন।

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধ শত বর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (ISISAR) ও গান্ধী সেবা সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ করেছি সঙ্ঘের মাণিক্য মঞ্চের এতদ অঞ্চলে সকলের কাছে সুপরিচিত হয়েছে। বেশ কিছু সংস্থা যেমন দমদম সংস্কৃতি মঞ্চ, ইকো, আত্মবিকাশ, ঐকতান, তুমি তিলোত্তমা - মঞ্চটিকে নিয়মিত ব্যবহার করেছেন। ইদানীং হলটি বাতানুকূল হয়েছে শ্রীযুক্ত সুজিত বসুর সহযোগীতায়।

বেশ কিছু সংস্থা যেমন 'যাত্রাপথ কালচারাল সোসাইটি', 'শৈলি', 'স্বপ্নরাগ', 'সঙ্গীত প্রিয় সংসদ', 'বাক' এখানে অনুষ্ঠান করেছে। ভীষ্মদেব সঙ্গীত মেমোরিয়াল তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানএখানেই করে আসছে। পৌষপার্বণ একাদশী তাদের কোনো নতুন বই প্রকাশনার অনুষ্ঠানটি মাণিক্য মঞ্চেই করে থাকে। 'ইচ্ছেডানা', 'সুতানটি সোসাইটি', 'টিউন', 'প্রয়াসী মননশীল কলাকেন্দ্র', 'সুরলহরী' উৎসব মিউজিক একাডেমি এদের সকলের কাছেই মাণিক্য মঞ্চ একটি বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছে।

ছবি: গৌতম সাহা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সঙ্ঘের চিকিৎসা পরিষেবা ও 'সেবা নিবাসের' স্থান সম্প্রসারণের জন্য বেশ কিছু সহৃদয় ব্যক্তি তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

নন্দিতা রুদ্র.....৭৫,০০০/-
ডঃ হিরন্ময় সাহা.....৫০,০০০/-
চন্দনা সাহা.....৫০,০০০/-
বিমলেন্দু হালদার.....৫০,০০০/-
শঙ্করলাল ঘোষাল.....২০,০০০/-
বাসুদেব ঘোষ.....২০,০০০/-
সুধীর চন্দ্র সাহা.....২০,০০০/-
সমর গাঙ্গুলী.....১০,০০০/-
রসময় চক্রবর্তী.....১০,০০০/-
সোনালী সাহা.....১০,০০০/-
প্রবীর গুহ ঠাকুরতা.....১০,০০০/-
পারমিতা মুখার্জী মল্লিক.....৬,০০০/-
স্বরাজিৎ সাহা.....৫,০০০/-
বাসন্তী দত্ত.....৫,০০০/-
সুরিন্দর হান্ডা.....৫,০০০/-
ইন্দ্র চন্দ্র বানসাল.....১১০০/-
স্বপন বেহেরা.....১০০০/-
রোহিনি বেহেরা.....১০০০/-
আশুতোষ ঘোষ.....১০০০/-
এন রবি.....৫০০/-
পদ্মজা আয়েঙ্গার.....৫০০/-

সংঘ সংবাদ

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগ খোলা থাকে প্রতি দিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এখানে নিয়মিত ডিজিটাল এক্সরে, ইকো-কার্ডিওগ্রাম, কালার ডপলার এসব পরিষেবার ব্যবস্থা আছে। প্যাথোলজি বিভাগটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুগার, লিপিড প্রোফাইল, থাইরয়েড এরকম বিভিন্ন প্রকারের রক্ত পরিক্ষা এখানে নিয়মিত করা হচ্ছে। নাম নথি ভুক্ত করে আসলে ভালো হয়। হাসপাতালের ফোন নম্বর - ২৫৩৪৫৫৭৯/ ৯৯০৩৩২১৭৭৭ এখানকার E-mail no: gsshospitalkolkata@gmail.com

বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ডাক্তাররা এখানে আসছেন। আপনারা এখানে আসুন এবং হাসপাতালের পরিষেবা গ্রহণ করুন। এই আমাদের প্রয়াস।

সুধাকুঞ্জ

বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়

স্থান - কেষ্টপুর ঘোষ পাড়া

কোলকাতা - ৭০০১০২

যোগাযাগ: **বাসুদেব ঘোষ**

৯৮৩১৩৪৫৯৩৩

টাটকা ও সুস্বাদু মিষ্টির একমাত্র প্রতিষ্ঠান

মধুমালঞ্চ সুইটস্

কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট। শপ নং-জি. ৩

১০৪ ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৭০০ ০৪৮

মো: 8420924470, 9674529934

Sanjay Doshi 98310-05348

Aruna Doshi : 033 2534-0545

॥ শ্রী ॥

SHREE OPTICAL

Family Opticians Since 2002

274, Canal Street, Sribhumi, Kolkata - 700 048

(Near Daffodil Nursing Home)

All major Debit / Credit Card Accepted

RAYBAN & VOGUE Frames Available Here

মেলার সেকাল ও একাল

অভ্র ঘোষ

ছবি: বিশেষ সৌজন্যে

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সবচাইতে বেশি ঘটে মেলায়। মেলা একান্ত স্বদেশি জিনিস। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে তাঁর অতিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে মেলার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে-কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে - সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই কাছে আসিয়া বসিবার দিন।'

অন্য আরেক প্রবন্ধে কবি জানিয়েছিলেন যে, বিদেশের অনুকরণে আমরা বড়ো মানুষকে স্মরণ করার জন্য ইদানিং সভা করি, মূর্তি বসাই। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন দেশের প্রথা ছিল বড়ো মানুষের নামে মেলা করা যেমন জয়দেবের মেলা। নিরক্ষর মানুষও এই মেলায় অংশ নিয়ে জয়েদেবের কথা জানতে পারে। গীতগোবিন্দের নাম শেনে। সেকালের মেলায় কিন্তু দোকানীরা কেবন জিনিসপত্র সাজিয়েই বসত না, মেলায় থাকত স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য ম্যাজিক , লণ্ঠনের সাহায্যে নানাধরণের প্রচার। যাত্রা গান, কথকথা, পুতুলনাচ, বাউলের আখড়ার মাধ্যমে বিনোদন ও স্বদেশবোধও জাগাওনোর চেষ্টও হত। বাংলার এমন কোনো গ্রাম-গঞ্জ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বছরের কোনো-না-কোনো সময়ে মেলার ব্যবস্থা হত না - সে ধর্মীয় মেলাই হোক আর ঋতু উৎসবের মেলাই হোক। এখনও বাংলার বহু গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় পীরের মেলা আয়জিত হয়। লালন মেলার তো শেষ নেই। আবাব চণ্ডীমেলা, শীতলা-মনসা-দক্ষিণ রায়ের মেলারও ছড়াছড়ি। লোকায়ত মেলা আর পূজা-পার্বণ নিয়ে গত শতকের ষাট-সত্তর-আশির যুগে এক বড়োমাপের কাজ করেছিলেন আই সি এস অশো মিত্র। তাঁর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল চার খন্ডে পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা-পার্বণের বৃত্তান্ত। এই খন্ডগুলি বেরোবার আগে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর গ্রামের চিঠি-তে বীরভূম জেলার মেলা-পার্বণ নিয়ে প্রচুর তথ্য জানিয়েছিলেন। বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত চেহারা এসব বৃত্তান্তে চমৎকার প্রস্ফূটিত। ইদানীংকালের ইতিহাসবিদরা সামাজিক ইতিহাস ও আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মেলার ইতিহাস এই কাজে আকরের কাজ করবে। সেকালের বাংলার মেলার প্রধান চরিত্র ছিল ধর্মীয়। সেটা স্বাভাবিক। মেলা ছিল লোকায়ত, আটপৌরে। আর লোকায়ত সংস্কৃতির প্রধানতম অবলম্বন ধর্ম। এখনও সেই পরম্পরা চলছে। বিশেষ করে একালের গ্রামীণ মেলাগুলির ক্ষেত্র থেকে শহুরে মেলার চরিত্র কিঞ্চিৎ ভিন্ন। সেকথায় পরে আসছি।

সেকালের মেলার সংগঠক ছিলেন গ্রামের জমিদার ও বিত্তবান মানুষজন। অনেক সময় দেখা যেত জমিদারদের পূর্বপুরুষের নামে মেলা পরিচিতি পেত। কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীর অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'শুভ উৎসব' এর কথা মনে পরে যায়। জমিদার-বাড়ির উৎসব পূর্ণতা পায় না সর্বস্তরের গ্রামীণ মানুষের ছোঁয়া না পেলে। সেখানে কেউ অনাবাসী নয়। সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে মানুষ না সামিল হলে উৎসব সর্বাথসার্থক হতে পারত না। গ্রামীণ কৌমস্বভাব, কৌমবোধ এইসব মেলা-পূজাপার্বণীতে প্রকাশিত হত।

ইদানীংকালে শহুরে মেলাগুলিতে কোথায় যেন এক কৃত্রিমতার ছোঁয়া লেগেছে। শহরের মানুষের উৎসববোধে স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিযোগিতার অভাব এতটাই প্রকট যে দুর্গাপূজো-কালীপূজোর সময় সেটা টের পাওয়া যায়। সরকারি-বেসরকারি পুরস্কারের প্রলোভনে পুরো মেলার চরিত্রে বাণিজ্যবৃদ্ধির পরিসর ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। স্পনসরশিপ, বিজ্ঞাপণ, ফ্লেক্স-ফেস্টুনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বেশ খানিকটা ধাক্কা খায়। মেলার প্রাণে যে সহযোগিতার বন্ধন ছিল নিবিড় সেকালে, একালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেষারেষিতে তা যেন বাণিজ্যিক হয়ে উঠেছে। এই কথাগুলি নিন্দার্থে বলছি না। যুগ পালটালে যুগধর্ম পালটায়। আগে যা ছিল জমিদার ধনবানদের তত্ত্বাবধানে, এখন সরকারি দাক্ষিণ্যে ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কৃপাধণ্য পশ্চিমবঙ্গের মেলা-পুজো-উৎসব। ফলে বাহিরঙ্গে বাড় ক্রমাগত বাড়ছে। কালের নিয়মে অন্তরাত্মায় তো কৃত্রিমতা আসবেই।

কথায় বলে, যা কিছু ছোটো তাই সুন্দর। Small is beautiful. বৃহদত্ব চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মন সবসময় মাতায় না। যেমন ধরুন কলকাতার বইমেলা। গত শতকের মধ্য-সত্তরে বইমেলায় গিয়ে যে সুখস্পর্শ অনুভব করতাম, যে-আন্তরিকতার ছোঁয়া মিলত, আড্ডার যে নিবিড় চরিত্র ছিল-তা কি এখন পাই? মেলা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হাঁপ ধরে যায়। আর ভিড় তো বাড়ছেই। ভিড় বাড়াটা হুজুগ হলেও ভালো হুজুগ, কিন্তু চরিত্র যে পালটায় তার ফলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বায়নের যুগে মেলার প্রকৃতির বদল ঘটবেই-- আপশোস করলে লোকে বলবে দুঃখ বিলাসী অথবা যুগোপযোগী নয়। তাই বদলটা মেনে নেওয়াই ভালো, বয়স হলে সবসময়ে মন সর্বকিছুতে সায় দেয় না - সেটাও স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বিশ্বায়নের তাণ্ডব প্রণয় শুরু হয়েছে - মেলার চরিত্রেও তার আঁচ লাগবে। তাই সুধীন দত্তকেই মেনে নেওয়া ভালো - 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!'

স্বয়ংপ্রভার শিশু বন্দনা

সেবক প্রতিবেদন: গত ১৬ মে , রবিবার সকাল বেলা সংঘের শিশুবিকাশের ছোটো ছোটো শিশু-কিশোরদের নিয়ে আনন্দ উৎসব হল। উদ্যোক্তা ছিল 'স্বয়ংপ্রভা' নামে একটি নব গঠিত মহিলা সংস্থা। কয়েকজন উৎসাহী মহিলা মিলে এই সংস্থাটি তৈরি করেছেন। তাঁদের ভাবনা হল, সব শ্রেনীর মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু করা। 'স্বয়ংপ্রভার' এই প্রথম অনুষ্ঠানে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের আঁকার খাতা ও মিষ্টি সহযোগে উৎসাহ প্রদান করে। এর সাথে জাদুকর শ্রীসুজয় কর্মকার জাদু-প্রদর্শনে শিশুদের মনোরঞ্জন করেন।

AGNI

AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.

Leader in Solar PV Engineering

An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company

MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner

HEAD OFFICE:

114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

স্মরণে

স্বর্গীয় পিতৃদেব স্বদেশলাল ঘোষালের
১৬তম মৃত্যু বার্ষিকীতে
(২২ শে এপ্রিল,২০০৩)
জানাই প্রণাম ও আন্তরিক শ্রদ্ধা।
শঙ্করলাল ঘোষাল ও পরিবার ।

বেঁচে থাকবে পৌষ মেলা

শঙ্কর তালুকদার

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা এখন সর্বজনবিদিত। তিনদিনের মেলা এখন ছয়দিনের মেলায় পর্যবসিত। শীত এলেই এই মেলায় যাওয়া নিয়ে ঘরে ঘরে গুঞ্জন শুরু

হয়ে যায়। এবার কি যাওয়া সম্ভব হবে? সত্যি কথা বলতে মেলায় যাওয়াটা যেন এক শ্রেণীর ফ্যাসানে পর্যবসিত। মানব মহলে তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এই মেলার কার্যকারিতা নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবত আমাদের একবার ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা দরকার।

সম্ভবত ১৮৬১ সালের ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর স্টেশনে নেমে যখন পালকি করে যাচ্ছিলেন, শুষ্ক চরাচরের মাঝে এক বিশাল ছাতিম গাছের তলায় বসে বিশেষ

ছবি: বিশেষ সৌজন্যে

প্রশান্তি লাভ করেন। এরপর ১৮৬৩ সালের ১লা মার্চ মহর্ষি প্রায় কুড়ি বিঘা জমি ভুবন সিংহ মহাশয়ের থেকে কিনে নেন এবং এটিকে ব্রাহ্মধর্মের সাধনা ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা ভাবেন। এইভাবে শান্তিনিকেতনের যাত্রা শুরু, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসে।

১৮৯১ সালের ৭ই পৌষ একটি কাঁচের মন্দির নির্মাণের পর জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেই সূত্রে ৭ই পৌষের দিন বড় উৎসব হত। এই উৎসবের পঞ্চম বছরে, অর্থাৎ, ১৮৯৬ সালে পৌষ মেলার সূত্রপাত।

অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে পৌষমেলার সঙ্গে কোনও বিশেষ ভাব-ধারণা যুক্ত ছিল না। তবে তথ্য দিয়ে প্রমাণ সাপেক্ষ হলেও, ক্রমান্বয়ে এই মেলার সাথে কিছু কিছু ভাব ধারণা অবশ্যই যুক্ত হয়।

১৯১৮ সালের ৮ই পৌষ। পৌষ উৎসব চলাকালীন বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রস্তর হয়। এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে শুধু ভারতীয়রাই নয়, বিদেশ থেকে, অর্থাৎ চীন, জাপান, পারস্য ও অন্যান্য দেশ থেকেও ছাত্র-ছাত্রী আসতে শুরু করে। এক কথায় বলা যেতে পারে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ও দেশ-বিদেশের মানুষদের মৈত্রী বন্ধনই এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য পৌষ উৎসবেও সাফল্যমণ্ডিত হয়, এমন ধারণা বা ভাবনা ধারাবাহিক ভাবে গড়ে উঠতে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা প্রয়োজন, এই সময় গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসেন এবং তাঁর ব্রতচারী আদর্শও পৌষমেলার অঙ্গ হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা হয়ে ওঠে গ্রাম ও শহরের সংযোগস্থল। একদিকে গ্রামের লোকেরা তাদের জিনিস শহরের লোককে বিক্রি করে আর্থিক সুবিধা পাবে, অন্যদিকে শহরের লোকেরা গ্রামের রূপ ও পরিবেশে আকৃষ্ট হবে। এখানে সবার সমানাধিকার থাকবে এবং মেলাটি বহু জাতি, বহু ভাষা-ভাষীর সংযোগস্থল হিসাবে গণ্য হবে। সেই কারণে গ্রামের নানান ক্রিয়কর্ম এই মেলায় প্রাধান্য পেত এবং আজও প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আজও বাউল, কবিগান, সাঁওতালী নাচ, সাঁওতালদের খেলাধূলা, মাটির হাঁড়ি-কলসি, বাজি ইত্যাদি এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও চটকদার সামগ্রীর আবাহনে হয়ত এদের গুরুত্ব কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে।

পৌষমেলা কেন শুরু হয়েছিল এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হতেই পারে, কিন্তু অন্যান্য মেলার মতো শুধু কিছু সামগ্রী কেনা-বেচার জন্য যে এই মেলা হয়নি, তা স্পষ্ট এই কারণে, আজও পৌষমেলার শুরু সেই ছাতিম তলার প্রার্থনা সভা দিয়ে।

সেই প্রার্থনা সভায় বিশেষ ভাবে সাম্যের কথা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মিলনের কথা উচ্চারিত হয়।

পৌষমেলা তাই অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেঁচে থাকবে সকলের হৃদয়ে, সেই আশা আমরা করতেই পারি।

সকল দেশের ফুলের মেলা

সুদেব সিনহা

শান্তিনকেতনের পৌষ মেলার চেহারা অনেক দিন ধরেই ক্রমশ বদলাচ্ছিল। বড়ো বড়ো বহুজাতিক সংস্থা তাদের পণ্য বিপণের ঢালাও আয়োজন করতো পৌষ মেলায়। এ নিয়ে একাধিক আশ্রমিক বিভিন্ন সময় তাঁদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ করেছিলেন। গত ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের পূর্বাঞ্চলের বেঞ্চ পৌষ মেলা নিয়ে একটি জরুরী নির্দেশ দেয়। ডিভিশন বেঞ্চ

ছবি: বিশেষ সৌজন্যে

জানায়, মেলা তিন দিনে শেষ করতে হবে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী বিষয় নিয়েই স্টল দেওয়া যাবে। কারণ গ্রিন ট্রাইব্যুনাল জানিয়ে দিয়েছিল, মেলা করতে হবে তিন দিনের। যাঁরা দীর্ঘ দিন পৌষ মেলায় যান, তাঁরা সকলেই জানেন, ৭ পৌষকে ঘিরেই পৌষ মেলার সূত্রপাত। কিন্তু এবছর মেলা অনুষ্ঠিত হলো ২৪ ডিসেম্বর, অর্থাৎ, ৭ পৌষের পরের দিন, ৮ পৌষ। অনেকেরই মনে পড়বে, ১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ একবার তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীতাচার্য শান্তিদেব ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে, মেলা চালানোই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক তাই ঘটলো। আমরা একবার স্মরণ করি সেইসব কথা। ৬ পৌষ রাত্রে শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'বৈতালিক' গান-এর মধ্যে দিয়ে পৌষ উৎসবের সূচনা হয়ে থাকে। ৭ পৌষ রাত্রে ভোরে ছাতিমতলায় উপাসনা এবং বৈতালিক-এর মাধ্যমে মূল উৎসবের সূচনা হতো। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর ৭ পৌষ ১২৫০ বঙ্গাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও ২০ জনের সঙ্গে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যে বছর রবীন্দ্রনাথের জন্ম, তার দুবছর পর ১৮৬৩ সালে ১ মার্চ জমির ব্যবস্থা হলে শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর ১৮৮৮ সালে ৮ মার্চ মহর্ষি ট্রাস্ট ডিড তৈরি করেন। এই ট্রাস্ট ডিডেই মেলার বিবরণ দিয়েছেন তিনি। ১৮৯৪ সালে শান্তিনিকেতনে ছোট মেলা ও যাত্রা উৎসব হয়। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ক্রমশ মেলার বিস্তার হয়। কিন্তু কবির ইচ্ছা অনুযায়ী এই মেলা প্রধাণত বাঙালির লোকায়ত সংস্কৃতির নানান দিককে মানুষের সামনে উপস্থিত করার লক্ষেই আয়োজন করা হতো। আজ সেসব কথা ভেবে হাহুতাশ করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইলো না।

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে, ৭ পৌষ মেলার সূচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - 'আমাদের চৈতন্যের সব আলো জ্বালি না, তাই আলো সকালে এসে আমাদের অন্তরাকাশে তার সাক্ষীকে খুঁজে পায় না, সে যে কতো বড়ো বিরহ দুঃখ তা জানিও না। প্রতিদিন তাই জঞ্জাল হয়ে উঠতে থাকে। বৎসরের অন্তত এই একটি দিন- এই উৎসবের দিনে কি আলো জ্বলবে না? প্রতিদিনের কাজ সংকীর্ণ আত্মীয়তার মন্ডলীর মধ্যে। সেখানে আমাদের ঘরের কোণের প্রদীপই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা শুভকর্ম বলি তাকেই, যে শুভকর্মের যোগে উৎসব হয়। সেই কর্মের দ্বারা সকলের সঙ্গে আমরা আমাদের সম্বন্ধ স্বীকার করি-- সেই সম্বন্ধবোধই কল্যাণ। এই শুভকর্মের উৎসবে প্রদীপশিখার কার্পণ্য তো চলে না, সেদিন আমাদের সকল আলো জ্বালিয়ে তুলতে হয়।' এই সকল আলো জ্বালিয়ে তোলার উৎসব ৭ই পৌষের উৎসব। এই দিনটিকে ঘিরেই পৌষ মেলার আয়োজন। যে চৈতন্যের আলোর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেই আলোর ছটায় তিনি আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন সর্বকাজে। স্বদেশি যুগের নেতাদের ঠাট্টার সুরে কবি বলেছিলেন, কথায় কথায় 'টাউন' হলে সভা ডেকে মানুষকে একত্র করা যাবে না। বরং মেলার আয়োজন করো।

সেই মেলায় উপস্থিত হোক আমাদের দেশের আউল-বাউল, ফকির, পীর, দরবেশ, সাধু, সন্ন্যাসী সকলে। কথক ঠাকুর রামায়ণ গান জুড়ে দিক। মেলার মাঠে কংসবধ যাত্রাপালা হোক। আউল-বাউলের কণ্ঠে বাজুক লালন শাহ ফকির, হাছন রাজাদের গান। নানা ভাষার মানুষ শুনুক সুফিয়ানার সংগীত। তবেই আলো-বাতাসের সঙ্গে মিশে যাবে এদেশের মর্মকথা। মানুষের অন্তরের কথা, প্রাণের ব্যথা। যা কোনোদিন সভা-সমিতির লোকাচারে শোনা যায়নি। চিরদিন তাকে রূপ দিয়েছে আমাদের দেশের মাঝি-মাল্লারা তাদের নদী-বক্ষের গানে, কীর্তনীয়ারা তাদের সুরে। এইসব নিয়েই বাংলাদেশ কিংবা ভারতবর্ষ। তারই এক ক্ষুদ্র সংরক্ষণ পৌষ মেলা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, 'সর্বমানবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবো। একদিন আমরা বলেছিলাম বিদেশি ফুলে আমাদের দেবতার পূজা হয় না-- কিন্তু আমাদের এখানে আজ আমরা যেন বলতে পারি সকল দেশের ফুল ছাড়া দেবতার পূজা সম্পূর্ণই হতে পারে না'।

OPD Dr. LIST GANDHI SEVA SADAN HOSPITAL

Daily From 8 am to 8pm

For Details & Appointment please Call 9903321777 & 033-2534-5579, E-mail : gsshospitalkolkata@gmail.com

Sunday Closed

		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
MEDICINE							
DR. T K. CHATTARAJ	MD					9am	
DR. SUDIPTA CHATTERJEE	MD(Med), DNB (Med)		4pm			4pm	
DR. NARAYAN BANERJEE	MD, (PGI) Chandigar		By Appointment			10am	
DR. PRIYADARSHI BAGCHI	MD(Med), PGDCC(Card)	6pm		6pm			6pm
DR. A V AGARWAL	MBBS, DNB (Family Med)	11am		11am			
DIABETOLOGY							
DR. S. B ROYCHOUDHURY	MBBS, MRCP,MSc(Diab)			4pm			
DR. SABYASACHI BANDOPADHYAY FRCP (Glas) C.C.T. in Diabetes&Endro.	MBBS, MD, MRCP(UK)	5.30pm					
CARDIOLOGY							
DR. SWAPAN DEY	MD, DM(Card)				9am		
GASTROENTEROLOGY							
DR. SABYASACHI ROY	MBBBS(Cal), MRCPI, FRCPI,FACP(USA)		By Appointment				
DR. ASISH KR. SAHA	MD. FRCP(Ed), FRCP(Gls), FACP (US)	6pm				6pm	
ORTHOPAEDIC							
DR. A. K. SINGH	D.OTHRO, MS(Ortho) Mrcs Ed(uk)			4pm			4-6pm
GYNAECOLOGY & OBSTETRICS							
DR. D. GANGULY	MD, DGO, FSIS	12am				4pm	11am
DR. BIBHASWATI ROY	MD, D&O		11am		11am		
DR. TRINA SENGUPTA	MBBS, DGO, DNB		10am		10am		
PAEDIATRIC							
DR. T. K. DAS	MBBS, DCH		9am		9am		9am
GENERAL PHYSICIAN							
DR. SAYANTAN MANNA	MBBS			11am			
DR. Col. AMITABHA GHOSH	MBBS		9am			9am	
CHEST MEDICINE							
DR. A. C. KUNDU	MBBS, DTCD(Cal)	1-30pm		1.30pm	By Appointment		1.30pm
FAMILY MEDICINE & SKIN							
DR. JOY BASU	MBBS, DNB, FRSM(Lond)	6pm			6pm		
DR. SUBHAS KUNDU	MBBS,DVS,ISHA(Banglore)		11am				
GENERAL SURGERY							
DR. DIPTENDU SINHA	MS, FAIS	11am		11am			
DR. Susenjit Pradhan Mahato	MS,			4pm			4pm
DR> SUSENJIT PRADHAN MAHATO	MS		12am				9am
PSYCHIATRY							
DR.(Col) PRADYUT SARKAR	MD		4pm				4pm
ONCOLOGY							
DR.Prof. SRIKRISHNA MONDAL	MD(PGMIR, Chandigarh)		By Appointment				
ENT							
DR. Prof. AJIT SAHA	MBBS(Gold), MS,DLO(Lond)		11am		11am		
DR. (Col) SOURAV CHANDRA	RCS(ENG), MS(ENG) MBBS DLO MS(Cal)	6pm		6pm	6pm		11am
EYE							
DR. SAIBAL MAITRA	MS(OPHTH)			6pm			6pm
DR. RUPAM ROY	MS(OPHTH)	6pm					
UROLOGY							
DR. SANDEEP GUPTA	MS, MCh(Urology & Kidney Transplant)				2pm		
DENTAL							
DR. SIDDHARTHA CHAKRABORTY	MDS						
DR. SANKHA SANTRA	BDS	10am	10am			10am	
DR. GARGI CHATTERJEE	BDS		4pm				4pm
DR. DEBASREE BANIK	BDS	4pm		10am			
DR. SANTANU MUKHERJEE	BDS			4pm	10am		
DR. SUDIPTA SAHA	BDS						

Doctors Consultation Fees Rs. 100, 150 and 200 only
Reliable Investigation Available Digital X-Ray,
USG, ECHO, COLOUR Doppler & Pathology
All at Subsidised & Affortable Rates.

Digital X-Ray	**Starts from**	**Rs. 150/-**
USG :	**Whole Abdomen**	**Rs. 800/-**
	Upper / Lower	**Rs. 400/-**
	Pregnancy Profile	**Rs. 400/-**
	Anomaly Scan	**Rs. 1200/-**
ECHO :	**Plain**	**Rs.700/-**
	Colour Doppler :	**Rs. 1000/-**
ECG :		**Rs. 100/-**
LABORATORY TESTS :		
BLOOD Sugar Fasting + PP		**Rs. 100/-**
LFT Rs.450,	**LIPID PROFILE**	**Rs.450,**
DENTAL : R.C.T.		**Rs.1500/-,**
Crowning/Tooth		**Rs. 1200/-**

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
৩য় বর্ষ ● ১৭তম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com